UG. CC-8 (Class -G.G)

উপন্যাসের উদ্ভব ক্রমবিকাশ

ক্লাস নোটস

আলোচনা টুকরো :১

উপন্যাস কথার অর্থ বাক্যারম্ভ,[উপ-নি-অস্+ঘঞ্ ভাব]। উপন্যাস শটির সঙ্গে উপন্যস্ত বা বিন্যস্ত কথাটি সম্পর্কযুক্ত। 'উপন্যাস' শব্দটি ইংরেজি Novel শব্দের পরিভাষারূপে গৃহীত। সাধারণ অর্থে উপন্যাস বলতে গদ্যে লিখিত দীর্ঘ উপস্থাপনাকে বোঝায়। ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তৃতি বেশি। উপন্যাস রচনায় ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা অপরিহার্য। একটি সার্থক উপন্যাসে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনাভঙ্গি, রস, সংলাপ, ভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে মূলত লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতিই প্রকাশ পায়। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে সমগ্র মানবজীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ে এবং বিভিন্ন রূপকথা ও পুরাণ সাহিত্যে। এ ছাড়া দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী ইত্যাদি সংস্কৃত গদ্যকাব্য এবং পালি ভাষায় রচিত জাতককাহিনীতেও উপন্যাসের কিছু কিছু উপাদান লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, যেমন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও উপন্যাসের লক্ষণ প্রায় সর্বাংশে বর্তমান। মৈমনসিংহ-গীতিকার মধ্যেও কেউ কেউ উপন্যাসের আংশিক ধর্ম লক্ষ্য করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব মূলত উনিশ শতকের প্রথম দিকে এবং এর উদ্ভবের মূলে রয়েছে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) নববাবুবিলাস (১৮২৫) নামে যে ব্যঙ্গাত্মক নকশা রচনা করেন তার মধ্যে প্রথম বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ ফুটে ওঠে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানা ক্যাথারিনা ম্যালেন্স রচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ গ্রন্থে প্রচারধর্মী জীবনচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৯৮) সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে যে-দুটি উপাখ্যান রচনা করেন তাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথেষ্ট উপাদান পরিলক্ষিত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে আলালের ঘরের দুলাল নামক যে ব্যঙ্গাত্মক নকশাটি রচনা করেন তাতে উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও সমাজচিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়েছে, যদিও এখানে উপন্যাসের কলাকৌশলে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বলে স্বীকৃত। তাঁর রচিত দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী, রোমান্টিক, সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দটি। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলি হলো দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২) ও সীতারাম (১৮৮৭); সামাজিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস হলো বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) এবং তাত্ত্বিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলি হলো ইন্দিরা (১৮৭৩), আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) ও রাধারাণী (১৮৮৬)।

পাশ্চাত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ ও তাতে কান্তি যোজনা করেন। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে নারীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, পুরুষের নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনিই প্রথম বিধবাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন। পরিণতিতে তিনিই আবার নীতিবাদী ও সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে কঠোর হয়েছেন। বঙ্কিমের পরে তাঁর আদর্শ নিয়ে যাঁরা উপন্যাস রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) স্বর্ণলতা এবং রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), জীবনসন্ধ্যা, সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৩) উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমের পরে মুসলিম ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভাব ঘটে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২)। তাঁর প্রথম উপন্যাস রত্নাবতী প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। কারবালার বিষাদময় কাহিনী নিয়ে তিন খন্ডে রচিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-৯১)। এ ছাড়া উদাসীন পথিকের মনের কথা, ইসলামের জয়, রাজিয়া খাতুন ইত্যাদিও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে যাঁর স্থান প্রথমে তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁর উপন্যাসে কল্পনা বিস্তারের চেয়ে সত্যানুসন্ধিৎসা অধিক বিদ্যমান। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে মিবার রাজ (১৮৭৭), ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), মালতী (১৮৭৯), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), স্নেহলতা (১৮৯২), কাহাকে (১৮৯৮), বিচিত্র (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) ও মিলনরাতি (১৯২৫) উল্লেখযোগ্য।

এরপর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর আবির্ভাব বাংলা উপন্যাসে একটি বিস্ময়কর বিবর্তন সূচনা করে। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সপ্রধান উপন্যাসের ধারা কিছুটা অনুসরণ করলেও পরের দিকে তিনি তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ উপন্যাস রচনা করে স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি মোট বারোটি উপন্যাস রচনা করেন। ইতিহাসকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) এবং রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাস রচনা করেন। ইতিহাস আশ্রিত হলেও এতে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। জীবনসমস্যাপ্রধান উপন্যাসের মধ্যে তাঁর চোখের বালি (১৯০৩) ও নৌকাডুবি (১৯০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর চোখের বালিতেই মানব-মানবীর নিষিদ্ধ প্রেম প্রথম স্বীকৃতি পায়।

গোরা (১৯১০) উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম উপন্যাসরূপে স্বীকৃত। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু মহাকাব্যের আদর্শে পরিকল্পিত। এটি বুদ্ধিবৃত্তিপ্রধান ও বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। ঘরে-বাইরে (১৯১৬) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪) স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত বিপ্লবাত্মক উপন্যাস। চতুরঙ্গ (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শভিত্তিক উপন্যাস। শেষের কবিতা (১৯৩০), মালঞ্চ (১৯৩৪), দুইবোন (১৯৩৩) ইত্যাদি আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও জীবনবোধের কাব্যধর্মী উপন্যাস। তাঁর যোগাযোগ উপন্যাসের উপভোগ্য বিষয় হলো এর কাব্যময় বিবৃতি এবং ভাবগম্ভীর চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণ।

রবীন্দ্রযুগের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা কাহিনীই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদ্বীপ (১৯১৫) ও সিন্দুর কৌটা (১৯১৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। রবীন্দ্রযুগেই আবির্ভূত হন বাংলা সাহিত্যের অতিশয় জনপ্রিয় ও শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস রচনায় তিনি স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসে বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনই প্রধানভাবে চিত্রিত হয়েছে। নারীর প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। সেসবের মধ্যে বড়দিদি (১৯১৩), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), রামের সুমতি (১৯১৪), পন্ডিতমশাই (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), চরিত্রহীন (১৯১৪), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা-পাওনা (১৯২৩), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯৩৪) ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরৎ-উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে চার পর্বে রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩)। এর ইন্দ্রনাথ চরিত্র শরৎচন্দ্রের তথা বাংলা উপন্যাসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এরকম চরিত্র বাংলা উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হলো রচনারীতির মাধুর্য ও ভাষার সারল্য।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক যিনি প্রধানত মুসলমান নারীসমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন। পদ্মরাগ (১৯২৭) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ ছাড়া অবরোধবাসিনী (১৯৩১), সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থে তিনি নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) রচিত উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবদুল্লাহ (১৯৩৩) উপন্যাস রচনা করেই তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এটি তৎকালীন মুসলমান সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সামাজিক কুসংস্কার যে মুসলমান সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে তারই করুণ চিত্র এতে ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী তাঁর রচনার বিশেষত্ব। মানবজীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে তিনি একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র উপন্যাসে মানব-প্রকৃতির প্রতিনিধি হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পথের পাঁচালীর (১৯২৯) অপু। এরই পরিপূরক গ্রন্থ হচ্ছে অপরাজিত (১৯৩১)। এ উপন্যাস দুটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ ধরনের উপন্যাসে প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে মানুষের গভীর জীবনদৃষ্টিও ফুটে উঠেছে। তাঁর আরণ্যক (১৯৩৮) উপন্যাসটি বিষয় পরিকল্পনার অভিনবত্বে বিস্ময়কর। এতে প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতিসমূহ প্রকাশ পেয়েছে। দেবযান (১৯৪৪) উপন্যাসে রোমান্টিক মনোবৃত্তিপ্রসূত পরলোকের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), ইছামতি (১৯৪৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ছিলেন সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন লেখক। তিনি তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির ওপরে সমাজকে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে সামন্ত সমাজের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব প্রায়শই প্রকট হয়েছে। তাঁর রচিত দুটি জনপ্রিয় উপন্যাস রাইকমল ও কবি-তে (১৯৪২) বৈষ্ণব ও কবিয়ালের বাস্তব জীবন চিত্রায়িত হয়েছে। হাসুলী বাঁকের উপকথায় (১৯৪৭) রাঢ়ের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় রয়েছে গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), কালিন্দী (১৯৪০), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), ধাত্রী দেবতা (১৯৩৯), চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), জলসাঘর (১৯৪২) ইত্যাদি উপন্যাসে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) ও কুহেলিকা (১৯৩১) তাঁর তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস, যা বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত। বিশেষকরে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে সাধারণ মানুষের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লষণের সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তাঁর বেশির ভাগ লেখায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস পদ্মা নদীর মাঝি-তে (১৯৩৬) যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদরপূর্তির সমস্যার এক বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) উপন্যাসে শশীর প্রতি কুসুমের যে দুর্দমনীয় আকর্ষণ তা বিশ্লেষিত হয়েছে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে। জীবনের সাংকেতিকতার ইঙ্গিত দান করেছে দিবা-রাত্রির কাব্য (১৯৩৫) উপন্যাস। নর-নারীর যৌনতত্ত্বের ওপর রচিত হয়েছে চতুষ্কোণ (১৯৪৮) উপন্যাসটি। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে জননী (১৯৩৫), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী রচনা করেন গাজরী, ঢোঁড়াই চরিতমানস। এ ছাড়া বিভাগপূর্বকালেই উপন্যাস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন এমন আরও কয়েকজন হলেন: মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু প্রমুখ। এ সময়ের কয়েকজন খ্যাতনামা মহিলা ঔপন্যাসিক হলেন: ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, সীতাদেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ।

বিষয়বস্তু ও শিল্পচেতনা অনুযায়ী বাংলা উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন:

ঐতিহাসিক উপন্যাস এ শ্রেণির উপন্যাস ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় এবং রচনার সময় ঔপন্যাসিককে অতীত জীবনের ইতিহাস, রীতি-নীতি, সংস্কার, সামাজিক ও গার্হস্থ্যজীবনের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি ও বৌঠাকুরাণীর হাট, সত্যেন সেনের আলবেরুণী ইত্যাদি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

সামাজিক উপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসে প্রধানত সমাজজীবন প্রতিফলিত হয়। সমাজের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাসমূহও এতে প্রধান হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল; শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, পল্লীসমাজ; রমেশচন্দ্রের সংসার, সমাজ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) লালসালু (১৯৪৮); শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) জননী (১৯৬১) ইত্যাদি এ শ্রেণিভুক্ত উপন্যাস।

আঞ্চলিক উপন্যাস এ উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রাবলি একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে নির্মিত হয়। কোনো কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস অনেক সময় আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) পদ্মা নদীর মাঝি, অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) তিতাস একটি নদীর নাম ইত্যাদি এ ধরনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এতে লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন ঘটে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এ শ্রেণিভুক্ত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

কাব্যধর্মী উপন্যাস এতে লেখকের জীবনদর্শন ও গীতিধর্মিতা প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা এ জাতীয় একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

রহস্য উপন্যাস অপরাধ ও গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ে এ ধরনের উপন্যাস রচিত হয়। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৫-১৯০৭) দারোগার দপ্তর, বনফুলের পঞ্চপর্ব, শরচ্চন্দ্র সরকারের গোয়েন্দাকাহিনী, অম্বিকাচারণ গুপ্তের গোয়েন্দা গল্প এবং ক্ষেত্রঘোষের আদরিণী এ শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

রোমান্সধর্মী উপন্যাস এতে কল্পনাভিসারী মন ও অতীতপ্রীতির কথা বেশি ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর এ ধরনের উপন্যাস।

হাস্যরসাত্মক উপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসে লেখক মানবজীবনের যে-কোনো একটি অসঙ্গতিকে বিষয়বস্তু করে হাস্যরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পতরু; ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) কঙ্কাবতী, ফোকলা দিগম্বর; চন্দ্রনাথ বসুর পশুপতি সম্বাদ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোষ্ঠীর ফলাফল ইত্যাদি এ শ্রেণির উপন্যাস।

পত্রোপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসের বক্তব্য পত্রের আকারে প্রকাশ করা হয় যেমন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) ক্রৌঞ্চমিথুন, বুদ্ধদেব গুহর সবিনয় নিবেদন ইত্যাদি।

পুরাণ কাহিনীমূলক উপন্যাস পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এ ধরনের উপন্যাস রচিত হয়। কাহিনীই এ ধরনের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এ ক্ষেত্রে দীনেশ সেনের শ্যামল ও কজ্জল, জড়ভরত ও বেহুলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে এ ধরনের উপন্যাস রচিত হয়। মণীন্দ্রলাল বসুর অজয়কুমার এ শ্রেণিভুক্ত উপন্যাস।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

চৈতন্যমূলক উপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসে লেখক মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে নিমজ্জিত নানা বিষয়ের আংশিক আভাস দিয়ে থাকেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে এরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া রূপক-প্রতীকী উপন্যাস এবং অস্তিত্ববাদী উপন্যাস আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের নতুন সংযোজন।

আলোচনা টুকরো -২

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তখন ঔপনিবেশিক শাসনের কাল এবং বাংলা উপন্যাস যাত্রায় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। মূলত সেই সময় সামাজিক নকশামূলক রচনা এবং ইতিহাসকেন্দ্রিক রোমান্সের ধারায় আধুনিক উপন্যাসের সূচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ। তবে আধুনিক বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বজনস্বীকৃত।

সেই সময় ঔপন্যাসিকরা আর্থ-সামাজিকভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকে এসেছিলেন। তাদের উপন্যাসে বাংলার ভূমি ও মানুষের উপস্থিতি থাকলেও তা ছিল ঔপনিবেশিক অবস্থান থেকে অভিজাত ও মধ্যবিত্তের প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মাণ। কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসে তা পরিলক্ষিত। নিম্নবর্গের মানুষের কথা ছিল উচ্চবিত্তীয় সামান্ত মানসিকতার মধ্য থেকে উপস্থাপিত। তাই বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরত্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর উপন্যাস নিরীক্ষায় বাংলার শিকড়ের আখ্যান উপস্থাপিত হলেও তা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রবহমানতায় আবিষ্ট উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত। তাদের দ্বারা উপন্যাস সাহিত্যের যে যুগের বিকাশ ঘটেছিল, তার বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় 'কল্লোল' বাস্তবতার যুগে। এ সময় থেকে বাংলা উপন্যাস গতানুগতিক ইউরোপীয় উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে আচ্ছন্ন না থেকে নতুনভাবে ভারতীয় জীবনমুখিতায় অভিষিক্ত হতে শুরু করে। এই পরিবর্তনীয় ভাবধারায় বাংলা উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের বাধা পরিধিকে অতিক্রম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপণে নতুন আখ্যান নিয়ে আসেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে। তারা দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও উপেক্ষিত নিম্নবর্গের সমাজ ও মানুষের কথা নিয়ে আসেন সংবেদনশীলভাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যেসব চরিত্র তৈরি করেছেন, তার বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্গের মানুষ। তার রচিত দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, এসব উপন্যাসের চরিত্ররা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসে তুলে আনলেন উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্তের মানুষের কথা, তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তার রচিত চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তা স্পষ্ট। শরত্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরের কথা, নারীর কথা এলো সমাজের মানবিকবোধ পরিবার ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে। তার চরিত্রগুলো প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে তুলে আনা। এক্ষেত্রে তার রচিত দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), দেনাপাওনা (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের আখ্যান নিয়ে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিমুখী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নতুনত্বে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষজনের গণ্ডি অতিক্রম করে নিম্নবর্গের মানুষজনকে নিয়ে এলেন কমিউনিস্ট-কথিত সমাজ রূপান্তরের মাধ্যমে। তার রচিত ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪০) ও কবি (১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসটি সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— শুধু তারাশঙ্করেরই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসটি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে উঠে তা হলো অস্পৃশ্য ডোম বা দলিত জনগোষ্ঠী থেকে কবি নির্মাণ। অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭) উপন্যাসে তিনি হাঁসুলী নদীর বাঁকে বসবাসকারী কাহার সমাজের মানুষ। নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫৩)-তে তিনি বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে রূপ দেন। মূলত তিনি বীরভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের লোকজীবন, গণমানুষ, উপকথা-রূপকথা গ্রহণ করে আঞ্চলিক উপন্যাসের সূচনা করেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী (১৯২৮)-তে তিনি শুধু গ্রামীণ জীবনকে চিত্রিত করেই আলোচিত হননি বরং তার প্রাকৃতবাদের প্রকাশও ঘটে। তবে তার আরণ্যক (১৯৩৯) উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেন— ...বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রাকৃতবাদ উভয় অর্থে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবের বিজ্ঞানী-সুলভ চিত্রায়ণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে 'ব্যাক টু নেচার' আবেদন। অন্যদিকে রাজনৈতিক উপন্যাস দিয়ে শুরু করলেও সতীনাথ ভাদুড়ী শিকড়সন্ধানী হয়ে চলে গেলেন একেবারে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের কাছে ঢোঁড়াইচরিতমানস (১৯৪৯, ১৯৫১) উপন্যাসে। সপ্তকাণ্ডের রামায়ণের মতোই এই উপন্যাসে সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত করে রচিত। সাত কাণ্ডের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন অধ্যুষিত এলাকা তাত্মাটুলি-ধাঙড়পল্লীর কাহিনী ও ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাজনীতি, সামন্তবাদ, কংগ্রেসি গান্ধীবাদ প্রভৃতিকে সমান্তরালে চিত্রিত করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যবহার ও নদীকেন্দ্রিক নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে খোদ জেলে পরিবার থেকে উঠে এসে হৃদয়াবেগে স্ফূর্ত হয়ে উপন্যাস রচনা করেন অদ্বৈতমল্ল বর্মণ। নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে তার অনবদ্য রচনা তিতাস একটা নদীর নাম (১৯৪৫-৪৭) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্গীয় আখ্যান নির্মাণে নিজস্ব ভাষার সক্রিয়তা তৈরি করেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। তার অন্তর্জলী যাত্রা (১৯৫৯) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরপর অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), দেবেশ রায় (১৯২৬), অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) বিষয়ের বহুমাত্রিকতায় যুক্ত হন। তারা নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এসে প্রতিবাদী ও বিপ্লবী উপাখ্যান নিয়ে আসেন উপন্যাস সাহিত্যে। বিশ শতকে তাদের এই ধারাকে উপন্যাসের নবযাত্রা বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র-

ইন্টার নেট।